icddr,b
KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

স্বাস্থ্য সংলাপ

ISSN 1021-2078

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ১৮ ■ সংখ্যা ২ ■ অগ্রহায়ণ ১৪১৬

নবজাতকের সাধারণ সমস্যা

অর্জুন দে
সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালি, ঢাকা
লক্ষ্মী সাহা
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোঃ ইকবাল
আইসিডিডিআর,বি

জন্মের পর প্রথম কয়েকদিন নবজাতকের কিছু সাধারণ শারীরিক সমস্যা দেখা যায়। এগুলো নিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মা ও অন্যান্য অভিভাবকগণ প্রায়ই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে, এ-লক্ষণগুলো বিশেষ কোনো রোগের বহিঃপ্রকাশ নয়। ধৈর্য্যের সাথে অল্প কিছুদিন অপেক্ষা করলেই ধীরেধীরে সমস্যাগুলো আপনা-আপনি সেরে যায়। সমস্যাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

মায়ের দুধের স্বল্পতা

নবজাতকের জন্মের অব্যবহিত পর থেকে ৩/৪ দিন মায়ের দুধের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। প্রাকৃতিক নিয়মেই পর্যাপ্ত বুকের দুধ আসতে এ-সময়টুকু লাগে। এতে অনেককেই অহেতুক চিন্তিত হতে দেখা যায়। কেউ কেউ ধৈর্য্য হারিয়ে শিশুকে গুঁড়াদুধসহ অন্যান্য খাবার দিতে শুরু করে দেন। এসব খাবার শিশুর কোনো উপকার করে না বরং মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। প্রকৃত ঘটনা হলো: শিশুর জন্মের পর প্রথম কয়েকদিন মায়ের বুক থেকে যে গাঢ় শালদুধ নিঃসৃত হয় পুষ্টিগুণের দিক থেকে তা খুবই উন্নতমানের এবং শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। পরিমাণে কম হলেও শিশুর প্রথম ৪৮ ঘণ্টার প্রয়োজন মিটানোর জন্য ঐ পরিমাণ শালদুধই যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে: শালদুধ ঠিকমত খাওয়ানো না-হলে স্বাভাবিক দুধ নিঃসরণ বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

অতএব, শিশুর জন্মের পরপরই মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করুন। শালদুধ অত্যন্ত পুষ্টিগুণসম্পন্ন, শিশুকে এটি খাওয়ান। প্রথম কয়েকদিন বুকের দুধের পরিমাণ কম মনে হলেও মনে রাখবেন: সে-পরিমাণই শিশুর জন্য যথেষ্ট, ধৈর্য্য হারিয়ে অন্য খাবার দিবেন না।

মাথা ফুলে-যাওয়া

স্বাভাবিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ যোনিপথে জন্ম-নেয়া শিশুদের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ-সমস্যা দেখা যায়। জন্মের সময় শিশুর মাথার যে-অংশটি আগে বের হয়েছে, সে অংশটি ফুলে গিয়ে মাথাটি লম্বাটে হয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে যায়। হাত দিয়ে স্পর্শ করলে এ-অংশটিকে নরম তুলতুলে লাগে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে বলা হয় caput succedenum, যা জন্মের পরপরই দেখা যায়। ৫ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত এ-অবস্থা থাকে। এর পর কোনো জটিলতা ছাড়াই এটি অদৃশ্য হয়ে মাথার আকৃতি স্বাভাবিক হয়ে যায়। অতএব, নবজাতকের এ-সমস্যা নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই; কোনো চিকিৎসা নেওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না; ধৈর্য্য নিয়ে কয়েকদিন অপেক্ষা করলেই ধীরেধীরে এটি ঠিক হয়ে যায়। তবে, মনে রাখতে হবে: জন্মের সময় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে মাথায় আরো দুয়েক ধরনের অন্য সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এরকম শিশুর ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

প্রথম পায়খানা ও প্রস্রাব

পরিণত সময়ে জন্ম-নেওয়া একটি স্বাভাবিক শিশু তার জন্মের পর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সাধারণত পায়খানা ও প্রস্রাব করে থাকে। তবে প্রথম পায়খানা করতে সর্বোচ্চ ২৪ ঘণ্টা ও প্রথম প্রস্রাব করতে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তবে পরিণত গর্ভের আগে জন্ম-নেয়া শিশুর ক্ষেত্রে প্রথম পায়খানা ও প্রস্রাব হওয়া যথাক্রমে ৪৮ ও ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত বিলম্বিত হতে পারে। এসময়ের মধ্যে প্রস্রাব

ভেতরের পাতায়

সোরিয়াসিস: রোগতত্ত্ব ও চিকিৎসা ৩
উচ্চ রক্তচাপ কমাতে খাদ্য ও ওজন নিয়ন্ত্রণ ৫
ধাতুভাঙা বা যোনিপথের নিঃসরণ ৬
যক্ষা রোগ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ৭
যৌনরোগের তথাকথিত স্থায়ী চিকিৎসা! ৮

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক আলেহান্দ্রো ক্যাভিওটো
উপ-প্রধান সম্পাদক প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এম শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক এম এ রহিম

সদস্য

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান ও রুবহানা রকিব

পৃষ্ঠাবিন্যাস সৈয়দ হাসিবুল হাসান
কম্পোজ হামিদা আক্তার

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বরাবর ইংরেজিতে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৮৮৬০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: msik@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: সিদ্দিক প্রিন্টার্স, ঢাকা

ও পায়খানা না-হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

জন্মের পর প্রথম ৩ থেকে ৫ দিন কম প্রস্রাব হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এসময় গাঢ় প্রকৃতির শালদুধ অল্প পরিমাণে নিঃসরণ হয় বলে শিশু স্বাভাবিক পরিমাণের তুলনায় কম খাবার পেয়ে থাকে। ফলে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ১ বা ২ বার প্রস্রাব হতে পারে। এতে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। তবে, পর্যাপ্ত বুকের দুধ পাওয়া শুরু করলে একটি স্বাভাবিক শিশু দৈনিক ৮/১০ বার প্রস্রাব করবে।

নবজাতকের পায়খানার বেলায়ও কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়। একটি স্বাভাবিক শিশু সারাদিনে কয়বার পায়খানা করবে তার আসলে তেমন কোনো ধরাবাঁধা হিসাব নেই। অন্য সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে শিশু দৈনিক ৪/৫ বার পায়খানা করতে পারে। তবে, ব্যতিক্রম হিসেবে কোনো কোনো শিশু ৩ থেকে ৫ দিন পর পায়খানা করে; আবার, কোনো কোনো শিশু পাতলা হলুদ রঙের (ডালের মত) অল্প-অল্প পায়খানা প্রায় প্রতিঘণ্টায় (বিশেষ করে বুকের দুধ খাওয়ার পরপর) করে থাকে। শিশুর খাওয়া ও ঘুম স্বাভাবিক হলে, ওজন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে, প্রস্রাবের পরিমাণ স্বাভাবিক হলে, পেট ফুলে না-গেলে, অত্যধিক বমি না-করলে, পায়খানাজনিত সাধারণ ঘটনাগুলোর জন্য বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। সমস্যাগুলো সাধারণত কয়েক মাসের মধ্যেই ঠিক হয়ে যায়।

মেয়ে-নবজাতকের যোনিপথে রক্তক্ষরণ

কিছু কিছু মেয়ে-নবজাতকের ক্ষেত্রে জন্মের ৫/৬ দিন পর যোনিপথে রক্তক্ষরণ (PV bleeding) হতে দেখা যায়। রক্তের পরিমাণ সামান্য থেকে মাঝারি ধরনের হতে পারে। রক্তক্ষরণ নিয়ে নবজাতকের মা ও অন্যান্যরা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। লক্ষ রাখতে হবে: শিশুটি বুকের দুধ খাচ্ছে কি না, কান্না ও নড়াচড়া স্বাভাবিক আছে কি না, শরীরের অন্য কোনো জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে কি না, কিংবা শিশুটি ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে কি না। এধরনের কোনো সমস্যা না-থাকলে যোনিপথে রক্তক্ষরণ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ভ্রূণ-অবস্থায় মেয়েশিশু ও মায়ের হরমোনের সংযোগ এবং জন্মের পরপরই সে-সংযোগের বিচ্যুতি থেকে এধরনের রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। এ-সমস্যা সাধারণত ৫ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হয় এবং কোনো ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই ধীরেধীরে বন্ধ হয়ে যায়। এধরনের রক্তক্ষরণের জন্য বিশেষ কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে না।

শরীরে ছোট ছোট লাল দাগ

অধিকাংশ শিশুর ক্ষেত্রেই জন্মের ৩ থেকে ৪ দিন পর শরীরে, বিশেষ করে মুখমণ্ডল, বুক ও পেটে, ক্ষুদ্রাকৃতির লাল রঙের দাগ (erythema toxicum) দেখা যায়। সংখ্যায় কয়েকটি থেকে শুরু করে কোনো কোনো শিশুর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শরীর এসব দাগে ছেয়ে যেতে দেখা যায়। এ-সমস্যা নিয়ে অনেক মা ও অভিভাবকই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে, এটি শিশুর অসুস্থতার কোনো লক্ষণ নয়। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই এগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে ২ থেকে ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত দাগগুলো থাকতে পারে। এর জন্য বিশেষ কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে না।

নাভীর যত্ন

জন্মের পরপরই নাভীর যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নাড় কাটার জন্য একটি নতুন জীবাণুমুক্ত ব্লেড (সম্ভব হলে সার্জিক্যাল ব্লেড) ব্যবহার করা উচিত। নাড় কাটার পরে নাভীকে জীবাণুমুক্ত সূতা দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এই সূতা সিদ্ধ করে শুকিয়ে আগেই তৈরি করে-রাখা বাঞ্ছনীয়। আজকাল প্লাস্টিকের তৈরি ক্ল্যাম্প (umbilical clamp) স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায়, যার ব্যবহার আরো সুবিধাজনক। অনেক ক্ষেত্রে নাভীর যত্ন হিসেবে নানাবিধ জিনিস প্রয়োগ করতে দেখা যায়, যেমন তেল, স্যাভলন, ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে, এসবের কোনো প্রয়োজন নেই বরং নাভী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক রাখাটাই বেশি জরুরী। এতে করে নাভীতে সংক্রমণের সম্ভাবনা খুব কম থাকে। মনে রাখতে হবে: নাভীর সংক্রমণ থেকেই ধনুষ্টংকার, সেপসিস, ইত্যাদি নানাবিধ জটিলতায় শিশুর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বমি

সাধারণত মায়েদেরকে শিশুদের বমি নিয়ে বেশি উৎকণ্ঠিত হতে দেখা যায়। অথচ বমি নবজাতকের একটি অতিসাধারণ সমস্যা। বেশিরভাগ শিশুই বুকের দুধ খাওয়ার পরপরই বমি করে থাকে। সাধারণত বমির পরিমাণ খুব কম হয় এবং এজন্য শিশুর অন্য কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। স্বাভাবিক ওজনবৃদ্ধি, হাসিকান্না, প্রস্রাবের পরিমাণ, ইত্যাদি ঠিক থাকলে বমি নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বমি (vomiting) না-বলে বলা হয় বাড়তি খাবার উগড়ে ফেলে-দেওয়া (posseting)।

বমি কখন প্রকৃতই দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে

বুকের দুধ খাওয়ার কিছুক্ষণ পর প্রচুর পরিমাণে বমি-হওয়া, পেট ফুলতে-থাকা, বমির পাশাপাশি অস্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব ও পায়খানা কমে-যাওয়া, বমির সাথে শরীর পানিশূন্য-হওয়া, ওজন বৃদ্ধি না-পেয়ে ওজন কমতে-থাকা, অনিদ্রা, ইত্যাদি লক্ষণগুলোর এক বা একাধিক পরিলক্ষিত হলে দেরি না-করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ■

সোরিয়াসিসঃ রোগতত্ত্ব ও চিকিৎসা

নারায়ণ কৃষ্ণ ভৌমিক
বারডেম হাসপাতাল
সৈয়দ হাসিবুল হাসান
আইসিডিডিআর,বি

সোরিয়াসিস ত্বকের একটি দীর্ঘমেয়াদী রোগ। এই রোগ একজনের শরীর থেকে অন্যের শরীরে ছড়ায় না। মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্বকে এবং গিঁটে-গিঁটে এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। জটিলতার মাত্রাভেদে শরীরের ছোট অংশ থেকে শুরু করে বড় এলাকাজুড়ে এই রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে, যা চিকিৎসার মাধ্যমে সাময়িকভাবে প্রশমিত হলেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটে।

পটভূমি

অতীতে মানুষ সোরিয়াসিস-কে কুষ্ঠরোগের একটি ধরন বলে মনে করতো। ১৮৪১ সালে প্রথম অস্ট্রিয় চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ফার্দিন্যান্দ ফন হেবরা এ-রোগের নাম দেন সোরিয়াসিস। নামটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'সোরা' (*psora*) থেকে, যার অর্থ 'চুলকানি'।

রোগের প্রকৃতি

সোরিয়াসিস রোগে সাধারণত ত্বকের উপর লালচে বর্ণের ফুসকুড়ির মতো জন্মায়, যাকে সোরিয়াটিক প্লেক বলা হয়ে থাকে। এসব অংশে প্রদাহ হয় ও ত্বকের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটে এবং ত্বকের উপাদানগুলো দ্রুত পুঞ্জিভূত হয়ে রুপালি-সাদা রঙ ধারণ করে। সাধারণত কনুই এবং হাঁটুর ত্বকে সোরিয়াসিসজনিত প্লেক বেশি দেখা যায়, তবে মাথা এবং যৌনাঙ্গের ত্বকসহ শরীরের যেকোনো অংশে এর বিস্তার ঘটতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গিঁটের বাইরের দিকে এ-রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

অনেক রোগীর ক্ষেত্রে সোরিয়াসিস শুধু হাত ও পায়ের নখে আক্রমণ করে। সোরিয়াসিস শরীরের বিভিন্ন গিঁটে প্রদাহের সৃষ্টি করতে পারে। এই অবস্থাকে বলা হয় সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস। সোরিয়াসিস-আক্রান্ত ১০-১৫ শতাংশ রোগীর মধ্যে সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস দেখতে পাওয়া যায়। সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস অনেকসময় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

যেকোনো বয়সে পুরুষ বা মহিলা উভয়েরই এই রোগ হতে পারে। তবে, সাধারণত ১৫-২৫ বছর বয়সে প্রথম এই রোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। শিশুদেরও সোরিয়াসিস হতে পারে। সোরিয়াসিস রোগীদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের বেলায় ২০ বছরের কম বয়সে এই রোগ ধরা পড়তে দেখা গেছে।

রোগ নির্ণয়

সোরিয়াসিস রোগ নির্ণয় করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো রক্ত-পরীক্ষা বা রোগ-নির্ণায়ক পদ্ধতি নেই। সাধারণত ত্বকের বাহ্যিক অবস্থা দেখে এ-রোগ সনাক্ত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ত্বকের অন্যান্য অস্বাভাবিকতা থেকে একে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্য ত্বকের বায়োপসি করা হয়। সোরিয়াসিস চেনার আরেকটি উপায় হলো: শরীরের আক্রান্ত স্থান ঘষলে বা চুলকালে ত্বকের নিচে সূক্ষ্ম রক্তবিন্দু দেখতে পাওয়া যায়।

সোরিয়াসিস-আক্রান্ত একজন রোগী

রোগের কারণ

সোরিয়াসিস-এর নির্দিষ্ট কোনো কারণ জানা নেই, তবে বংশানুক্রমিকভাবে এ-রোগ বিস্তারের প্রবণতা রয়েছে। সোরিয়াসিস-এর কারণ-সংক্রান্ত ধারণামতে, ত্বকের অত্যধিক বৃদ্ধিই এ-রোগের জন্য দায়ী। শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রভাবে ত্বকের কোষের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে এমনটি ঘটে। বিভিন্ন রকমের সংক্রমণের হাত থেকে মানবদেহকে রক্ষাকারী টি-সেল অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ত্বকের ডার্মিস (dermis) স্তরে ঢুকে এধরনের জটিলতার সৃষ্টি করে। মানসিক চাপ, সহায়ক চিকিৎসায় বিরতি, অতিরিক্ত মদ্যপান এবং ধুমপান সোরিয়াসিসজনিত অবস্থার অবনতি ঘটাতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যত কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই সোরিয়াসিসজনিত অবস্থার উন্নতি বা অবনতি ঘটতে দেখা যায়।

তৈলাক্ত বা আর্দ্র ত্বকের চেয়ে শুষ্ক ত্বকে সোরিয়াসিস বেশি দেখা যায় এবং অনেকসময় ত্বকে আঁচড় বা ক্ষত থেকে সোরিয়াসিস-এর উদ্রেক হয়। ত্বকের আর্দ্রতাকে ধরে রাখার জন্য সোরিয়াসিস রোগীদের সাবান ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে বলা হয় এবং গোসলের সময় শরীর ঘষার জন্য অমসৃন উপকরণ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়, যা ত্বকে ছোট ছোট আঁচড় সৃষ্টি ক'রে সোরিয়াসিস-এর প্রকোপ বাড়াতে পারে।

সোরিয়াসিস-এর ধরন

বাহ্যিক লক্ষণ এবং প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে সোরিয়াসিস-কে প্রধানত সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়। সেগুলো নিচের অংশে আলোচিত হলো:

ফ্লেক্সুরাল (flexural) সোরিয়াসিসঃ এধরনের সোরিয়াসিস সাধারণত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থলে এবং ত্বকের ভাঁজে-ভাঁজে বিস্তার লাভ করে। যৌনাঙ্গের আশেপাশে, বগলের নিচে, মেদবহুল পেটের নিচের অংশে এবং স্তনের নিচে এধরনের সোরিয়াসিস সৃষ্টি হয়, যা কাপড়ের ঘষায় এবং ঘামের ফলে বৃদ্ধি পায়।

গুটেইট (guttate) সোরিয়াসিসঃ এক্ষেত্রে আক্রান্ত অংশজুড়ে ছোট ছোট গোল ফুসকুড়ির মতো জন্মে। পিঠ, হাত, পা এবং মাথার তালুর মতো শরীরের বিস্তৃত অংশগুলোতে এমন ফুসকুড়ি দেখা দেয়।

পাস্টুলার (pustular) সোরিয়াসিসঃ এধরনের সোরিয়াসিস রোগে অসংক্রামক পুঁজযুক্ত ছোট ছোট গোটার মতো দেখা যায়, যার নিচের এবং চারপাশের নরম অংশ লাল রঙ ধারণ করে থাকে। এগুলো হাত বা পায়ের নির্দিষ্ট অংশে বা শরীরের যেকোনো অংশে হতে পারে।

প্লেক সোরিয়াসিস-আক্রান্ত ত্বক

প্লেক (plaque) সোরিয়াসিস: এধরনের সোরিয়াসিস সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ৮০-৯০ শতাংশ সোরিয়াসিস রোগী এর দ্বারা আক্রান্ত। এক্ষেত্রে শরীরের আক্রান্ত অংশের ত্বক কিছুটা উঁচু হয়ে ফুলে ওঠে, প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং রুপালি-সাদা রঙের আবরণ পড়ে, যাকে প্লেক বলা হয়।

নেইল (nail) সোরিয়াসিস: নেইল সোরিয়াসিস-এর ফলে হাত ও পায়ের নখের কিছু অংশ বিবর্ণ হয়ে ওঠে, নখে লম্বা সাদা রেখার সৃষ্টি হয়, নখের নিচের ত্বক পুরু হয়ে যায় এবং অনেকসময় নখ পড়েও যায়।

সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস (arthritis): এক্ষেত্রে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থলে সংযোগকারী টিস্যুগুলোতে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। হাত ও পায়ের গিঁটগুলোতে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, যার ফলে আঙুলগুলো ফুলে বিশ্রী আকার ধারণ করে। এছাড়াও, নিতম্ব, হাঁটু ও শিরদাঁড়ায় সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস দেখা যায়। এধরনের সোরিয়াসিস অনেকসময় ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে।

এরিথ্রোডারমিক (erythrodermic) সোরিয়াসিস: এধরনের সোরিয়াসিস রোগে শরীরের বিস্তৃত অংশে, এমনকি সারা শরীরজুড়ে, ত্বকের প্রদাহ ঘটে এবং আক্রান্ত স্থানগুলো ফুলে ওঠে, ভীষণ চুলকায় ও জ্বালাপোড়া হয়। এরকম অবস্থা কখনো কখনো মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে কারণ এক্ষেত্রে শরীরের তাপমাত্রা বণ্টনের প্রক্রিয়া বিপুলাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, যার ফলে নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

সোরিয়াসিস-আক্রান্ত নখ

রোগের প্রভাব

সোরিয়াসিস একজন ব্যক্তির জীবনে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। সোরিয়াসিসজনিত চুলকানি, ব্যথা এবং অস্বস্তি রোগীর প্রাত্যহিক কাজে বিরাট বাধার সৃষ্টি করে, ফলে তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। হাতে ও পায়ে প্লেক থাকলে খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য নৈমিত্তিক কাজ ও হাঁটাচলায় রোগীকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। উচ্চমাত্রার সোরিয়াসিস-এর ফলে জীবন বিপন্ন হয়, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

সোরিয়াসিস-এর চিকিৎসা বেশ ব্যয়বহুল, ফলে রোগীর আর্থিক অবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এছাড়াও, এ-রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি হীনমন্যতায় ভুগতে পারে এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজেকে অস্পৃশ্য মনে করতে পারে।

চিকিৎসা

সোরিয়াসিস পুরোপুরি নিরাময় হয় না, তবে সহায়ক চিকিৎসার সাহায্যে এ-রোগের প্রকটতা কমিয়ে রাখা যায়। বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার মাধ্যমে রোগের উপশম হয়, কিন্তু ভবিষ্যতে তার পুনরুদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। একেকজন রোগীর ক্ষেত্রে একেক ধরনের চিকিৎসা কার্যকর হতে পারে, যা রোগের ধরন, মাত্রা এবং রোগীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিত্তিতে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ নির্ধারণ করে থাকেন।

সাধারণত শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অবদমিত করে রাখে এমন অষুধের (immunosuppressant drugs) সাহায্যে সোরিয়াসিস-এর চিকিৎসা করা হয়। সোরিয়াসিস নিয়ন্ত্রণে alefacept-জাতীয় অষুধ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সোরিয়াসিসজনিত প্রদাহ রোধে চিকিৎসক অনেক সময় রোগীকে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকজাতীয় অষুধ এবং বাহ্যিকভাবে ব্যবহার্য মলম দিয়ে থাকেন।

সোরিয়াসিস-এর আরেকটি ফলপ্রসূ চিকিৎসা হলো ফটোথেরাপি (phototherapy)। দেখা গেছে: আলোর অতি-বেগুনী রশ্মি সোরিয়াসিস-এর জটিলতা নিরসনে বিশেষ উপযোগী। তাই একে ব্যবহার করে সোরিয়াসিস-এর চিকিৎসায় বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়।

বস্তুত, সোরিয়াসিস-এর চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগের প্রকৃতি ও রোগীর অবস্থা বুঝে সম্ভাব্য চিকিৎসা-পদ্ধতি স্থিরীকরণের বিষয়টি বেশ স্পর্শকাতর এবং জটিল। কাজেই, এ-রোগের চিকিৎসার জন্য কোনো রোগীর অবশ্যই অভিজ্ঞ চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া উচিত ■

উচ্চ রক্তচাপ কমাতে খাদ্য ও ওজন নিয়ন্ত্রণ

কাজী দিলরুবা মিতা
তানিয়া সুলতানা
আইসিডিডিআর,বি

হাইপারটেনশন উচ্চ রক্তচাপজনিত একটি স্বাস্থ্যসমস্যা যা নিয়ন্ত্রণ করা না-হলে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হয়। নিয়মিত পথ্য সেবন এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পথ্য পরিবর্তন ও ওজন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিকে বলা হয় non-pharmacologic measures বা অষুধ ব্যবহার না-করে প্রাকৃতিক উপায়ে সমস্যার নিরসন। ধুমপান ত্যাগ, মানসিক চাপ কমানো, মদ্যপান নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত ব্যায়াম, ইত্যাদি বিষয়গুলো এ-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। বিষয়গুলো একসাথে মেনে চললে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

উচ্চ রক্তচাপে পুষ্টির ভূমিকা

নির্দিষ্ট কিছু পথ্য উচ্চরক্তচাপকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে: পথ্য-তালিকায় অত্যধিক বা বাড়তি লবণ উচ্চ রক্তচাপকে বাড়িয়ে তোলে। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর বর্তমান নীতিমালায় বলা হয়েছে: খাবারে অত্যধিক লবণ উচ্চ রক্তচাপ ঘটায়।

ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। প্রস্তুতকৃত বা শোধিত খাবার, যেমন টিনজাত খাদ্য এবং প্যাকেটজাত স্যুপ-সামগ্রী ও স্ন্যাকজাতীয় খাদ্যে এসব পুষ্টি উপাদান কম থাকে। এই খাবারগুলোতে সাধারণত উচ্চমানের লবণ থাকে। প্রস্তুতকৃত খাদ্য কম খেলে, বেশি পরিমাণে ফল ও সব্জি খেলে এবং বেশি পরিমাণে তৈলাক্ত খাবার না-খেলে শরীরে উপকারী পুষ্টি উপাদানগুলো বৃদ্ধি পায় এবং একই সাথে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণের মাত্রা কমায়। সম্পৃক্ত চর্বি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। মোট ক্যালরির শতকরা ১০ ভাগ আসা উচিত সম্পৃক্ত চর্বি থেকে এবং ৩০ ভাগ সাধারণ চর্বি থেকে।

খাবারের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ

খাবারের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিকে ইংরেজিতে Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) বলা হয়। রক্তচাপ কমাতে খাদ্য-তালিকায় ফল, সব্জি এবং কম চর্বিযুক্ত খাবার যুক্ত করতে হবে, যা সম্পৃক্ত চর্বি এবং মোট চর্বি কমাতে সাহায্য করে।

নিচের সারণীতে কিছু খাবারের সুপারিশ করা হলো, যা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে:

খাদ্যের প্রকার	সুপারিশকৃত পরিবেশন
দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার	প্রতিদিন ৩ বেলা
ফল	প্রতিদিন ৪-৫ বেলা
শাক-সব্জি	প্রতিদিন ৭-৮ বেলা
শস্যজাতীয় খাবার	প্রতিদিন ১-২ বেলা
গরু-খাসি, হাঁস-মুরগির মাংস, মাছ, শীমের বীচি ও বাদাম	প্রতিসপ্তাহে ৪-৫ বার

সব্জিবহুল পথ্য রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। DASH-পথ্যকে খুব সহজেই সব্জিবহুল পথ্যে পরিণত করা যায় যদি মাংসের পরিবর্তে সীমজাতীয় খাদ্য যুক্ত করা হয়।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে পথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কোনো ব্যক্তির রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার খাদ্য-তালিকা ও খাদ্যাভাস পরিবর্তন এবং রন্ধন-প্রণালীতে পরিবর্তন এনে পথ্য পরিবর্তন করা হয়। নিচে কয়েকটি পথ্য এবং এগুলোর উপাদান বিষয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্য দেওয়া হলো:

সোডিয়ামজাতীয় লবণ

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে খাবারে সোডিয়ামজাতীয় লবণের মাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চমাত্রার সোডিয়ামবিশিষ্ট পথ্য থেকে নিম্নমাত্রার সোডিয়ামবিশিষ্ট পথ্য রক্তচাপ কমিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে। প্রতিদিন সোডিয়াম গ্রহণ ৪,০০০ মিলিগ্রাম থেকে ২,০০০ মিলিগ্রাম কমালে রক্তচাপ পরিমাপক যন্ত্রে পারদস্তম্ভের উচ্চতা ২-৩ মিলিমিটার কমে যায়।

মদ

যারা মদ্যপান করে না তাদের চেয়ে যারা প্রতিদিন মদ্যপান করে তাদের রক্তচাপ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। উচ্চ রক্তচাপে মদ্যপানের এই প্রভাব কতখানি মদ খাওয়া হয় তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যখন কেউ দিনে ৫ বার মদ্যপান করে তখন উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়।

শাক-সব্জিবহুল পথ্য

সব্জিবহুল পথ্য রক্তচাপ কমায় কারণ এগুলো উচ্চ রক্তচাপের বিপরীতে কাজ করে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে: সব্জিবহুল পথ্যে আঁশের পরিমাণ বেশি, যা রক্তচাপের ওপর প্রভাব ফেলে। আঁশসমৃদ্ধ খাদ্যের পরিমাণ বাড়ালে রক্তচাপ কমে যায়। প্রতিদিন ২০-৩৫ মিলিগ্রাম আঁশবহুল পথ্য সুপারিশ করা যায়। প্যাকেটজাত খাবারে এক পরিবেশনে কতখানি আঁশ আছে তা প্যাকেটের ওপরের তথ্য পড়ে জানা যায়।

মাছ

বেশি-পরিমাণে মাছ খাওয়া রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ওজন কমানোর পাশাপাশি মাছ বেশি খেলে রক্তচাপ কমতে থাকে।

ক্যাফেইন

ক্যাফেইনসমৃদ্ধ খাবার খেলে রক্তচাপ সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে পারে, যদিও এর প্রভাব ক্ষণস্থায়ী।

ব্যায়ামের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ

যেসব ব্যায়াম করলে অক্সিজেন গ্রহণ বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের শিরা-উপশিরা উজ্জীবিত হয়, প্রতিদিন খোলামলা পরিবেশে এমন ব্যায়াম করলে রক্তচাপ পরিমাপক যন্ত্রে পারদস্তম্ভের উচ্চতা ৫ মিলিমিটার থেকে ১৫ মিলিমিটার পর্যন্ত কমে যেতে পারে। তবে, সব বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য এটা প্রযোজ্য নয়। ব্যায়ামের উপকারিতা পেতে হলে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। যদি ব্যায়াম বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে রক্তচাপ পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

ওজন কমানোর মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ

অতিরিক্ত দৈহিক ওজন রক্তচাপ বৃদ্ধি এবং হৃদরোগের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। খাদ্য-তালিকায় ক্যালরির পরিমাণ কমিয়ে এবং শারীরিক পরিশ্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে ওজন কমানো সম্ভব। প্রতিকেজি ওজন কমানোর ফলে রক্তচাপ পরিমাপক যন্ত্রে পারদস্তম্ভের উচ্চতা ১ মিলিমিটার হ্রাস পায়।

উপসংহার

রক্তচাপ একটি ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃতির রোগ হলেও খাদ্যাভ্যাস ও জীবন-যাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কিংবা অন্যান্য জটিলতা থেকেও মুক্ত থাকা সম্ভব ■

ধাতুভাঙা বা যোনিপথের নিঃসরণ

কারণ ও করণীয়

মোছাঃ আরিফা শারমিন
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
জান্নাতুল ফেরদৌস
আইসিডিডিআর,বি

ধাতুভাঙা বা যোনিপথের নানা ধরনের নিঃসরণ বাংলাদেশসহ পৃথিবীর স্বল্পোন্নত দেশের মহিলাদের একটি সাধারণ স্বাস্থ্যসমস্যা। বাংলাদেশে শতকরা ৯০ ভাগ মহিলারই এই সমস্যা রয়েছে। যদিও এটি একটি সাধারণ সমস্যা, অনেক সময় জটিল রোগের উপসর্গ হিসেবেও এটি দেখা দিতে পারে।

যোনিপথে অনেক ধরনের নিঃসরণ হতে পারে। তবে, এগুলোকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) স্বাভাবিক বা ফিজিওলজিক্যাল নিঃসরণ এবং (২) অস্বাভাবিক বা প্যাথলজিক্যাল নিঃসরণ।

স্বাভাবিক নিঃসরণ

নিচে বর্ণিত স্থান থেকে যে মিশ্রিত নিঃসরণ হয় তাকে স্বাভাবিক নিঃসরণ হিসেবে গণ্য করা হয়:

- যোনিমুখের আশেপাশে অবস্থিত বার্থোলিন, সিবাসিয়াস, সোয়েট (ঘর্ম), অ্যাপোক্রাইন, ইত্যাদি নামের কতগুলো গ্রন্থি থেকে
- যোনিপথ থেকে
- জরায়ুমুখ এবং জরায়ু থেকে

এসব নিঃসরণের পরিমাণ সাধারণত এমন হয় যে, তা যোনিপথকেই শুধু ভেজা রাখে এবং কাপড়ে কোনো দাগ পড়ে না। কোনো কোনো সময় একটু বেশি হলেও তাকে স্বাভাবিক নিঃসরণ বলেই ধরে নেওয়া হয়। ঋতুস্রাবের আগে ও গর্ভকালীন সময়ে নিঃসরণ স্বাভাবিক নিয়মেই বেশি হতে পারে।

অস্বাভাবিক নিঃসরণ

কারণ চিহ্নিত করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে অস্বাভাবিক নিঃসরণকে নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে:

লিকোরিয়াজনিত নিঃসরণ

যখন স্বাভাবিক নিঃসরণের পরিমাণ অতিরিক্ত হয়, তখন তাকে লিকোরিয়া বলা হয় এবং এটি অস্বাভাবিক শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেক সময় রোগী বলে থাকে: মাড়ের মত ঘন ধাতু বের হয় এবং শুকিয়ে গেলে কাপড়ে বাদামী রঙের দাগ পড়ে। এধরনের ধাতুভাঙার কিছু কারণ নিচে বর্ণিত হলো:

- সন্তান প্রসবের আগে অনেক ক্ষেত্রে যোনিপথে পিচ্ছিল পদার্থ বের হতে থাকে। এতে ভয়ের কিছু নেই। গর্ভকালীন সময়ে প্ল্যাসেন্টা বা গর্ভফুল দিয়ে মায়ের হরমোন বাচ্চার শরীরে আসার কারণে এমনটি হয়ে থাকে। সাধারণত ১ থেকে ৫ দিন এই নিঃসরণ চলতে থাকে। তবে, কারো কারো ক্ষেত্রে ১০ দিন পর্যন্ত এ-অবস্থা চলতে পারে এবং এর পর নিঃসরণ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায়।
- বয়ঃসন্ধিকালে সাধারণত প্রথম ঋতুস্রাব বা মাসিক শুরু হবার দু'তিন বছর আগে ও পরে প্রবল পরিমাণে ধাতু ভাঙতে পারে। এটি স্বাভাবিক নিয়মে ঠিক হয়ে যায়।
- অনেকসময় অসুস্থ শরীর, দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত মন এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণেও অস্বাভাবিক মাত্রায় নিঃসরণ হতে দেখা যায়। যারা বসে কাজ করেন কিংবা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করেন, তাদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটতে পারে।
- যোনিপথে একধরনের অসুখের কারণে অস্বাভাবিক নিঃসরণ হতে পারে। এ-রোগে যোনিপথ দানা-দানা অনুভূত হয় এবং লাল হয়ে যায়। এসময়ে প্রচুর ধাতু ভাঙে।
- জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য বড়ি খেলেও অনেক সময় অস্বাভাবিক নিঃসরণ হতে পারে।
- কারো ডায়াবেটিস থাকলেও অস্বাভাবিক নিঃসরণ হতে দেখা যায়।

প্রদাহজনিত নিঃসরণ

যৌনাঙ্গে প্রদাহজনিত নিঃসরণে অনেকসময় পুঁজ মিশ্রিত থাকে বা সবটাই পুঁজের মত দেখা যায়। অনেক সময় একে 'ঘিয়া' বা সবুজ রঙেরও মনে হয়। নিম্নোক্ত কারণে এধরনের নিঃসরণ হয়ে থাকে:

- ভালভোভ্যাজাইনাইটিস, গনোরিয়া বা ছত্রাক কিংবা অন্য কোনো জীবাণুজনিত রোগের কারণে অস্বাভাবিক নিঃসরণ হতে পারে। ছত্রাক বা ক্যানডিডিয়াসিস রোগের সংক্রমণ ঘটলে রোগী বলে থাকে তার ঘন দইয়ের মতো ধাতু ভাঙে এবং মাসিকের আগে বেশি হয়। যোনিপথের চারদিকে প্রচণ্ড চুলকানি দেখা দেয়। ট্রাইকোমোনিয়াসিস রোগের আক্রমণেও এমনটি হয়। এ-রোগে নিঃসরণ ফেনাযুক্ত হয়, সবুজ রঙের হয়ে থাকে এবং মাসিকের পরপর বেশি হয়। এক্ষেত্রেও যোনিপথের চারদিকে চুলকানি দেখা দেয়।
- সার্ভিসাইটিস মানে জরায়ুমুখে কোনো ধরনের সংক্রমণ। এর কারণেও সাদা-সাদা স্রাব হয়।
- জরায়ুর ভিতরের আবরণের নাম এন্ডোমেট্রিয়াম। এখানে কোনো সংক্রমণ দেখা দিলে তাকে এন্ডোমেট্রাইটিস রোগ বলা হয়। এধরনের সংক্রমণের বেলায় সাদা-সাদা স্রাব হতে পারে।
- যৌনাঙ্গের ভেতর কোথাও ঘষা-খাওয়ার কারণে সংক্রমণ দেখা দিলেও স্রাব হতে পারে।

টিউমারজনিত নিঃসরণ

যোনিপথ, জরায়ুমুখ বা জরায়ুতে কোনো টিউমার হলে প্রথমে সাদা বা ঘিয়া রঙের নিঃসরণ হয় এবং দুর্গন্ধ থাকে না। যখন এতে সংক্রমণজনিত ঘা হয় তখন নিঃসরণে পুঁজের সাথে রক্ত থাকে এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়। সাধারণত ক্যান্সার হলে এমনটি হয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

সাধারণত রোগীর কাছ থেকে ভালোভাবে সমস্যা সম্পর্কে শুনলে ধারণা করা যায় কী কারণে নিঃসরণ হচ্ছে। এছাড়া, পরীক্ষাগারের ব্যবস্থা থাকলে যোনিপথের নিঃসরণ-এর নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

যদি নিঃসরণ পিচ্ছিল এবং পুঁজ-মেশানো থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে রোগীর গনোরিয়া বা ক্ল্যামাইডিয়া হয়েছে। নিঃসরণ যদি গাঢ় ফেনাযুক্ত এবং সবুজ রঙের হয়, তাহলে ট্রাইকোমোনিয়াসিসের জন্য হয়েছে। যদি দইয়ের মতো হয়, তাহলে ক্যানডিডিয়াসিসের কারণে হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে একেক রোগের জন্য নির্ধারিত চিকিৎসা দেওয়া হয়। যেখানে পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, সেক্ষেত্রে এমন চিকিৎসা দেওয়া হয় যাতে একসঙ্গে সবগুলো রোগেরই উপশম হয়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

চিকিৎসা বা প্রতিষেধকের চেয়ে প্রতিরোধ সবসময়ই

শ্রেয়। মেয়েরা চিরকালই কমবেশি অবহেলার শিকার। এরা এমনিতেও ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় কম। বাংলাদেশের মেয়েরা কম শিক্ষিত বলে নিজেরাও সচেতন নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে রোগ-শোকের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কুসংস্কার কাজ করে বেশি।

যোনিপথের নিঃসরণের চিকিৎসা সাধারণত এটি কী কারণে হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে। যোনিপথের নিঃসরণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মহিলা ধাতুভাঙা/সাদাস্রাব বা লিকোরিয়ার শিকার। এ-সমস্যা প্রথম মাসিকের দু'তিন বছর আগে থেকে দেখা দিতে পারে। এতে ভয় পাবার কিছু নেই—এই মর্মে রোগীকে আশ্বস্ত করতে হবে। পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এবং সুতি-কাপড় পড়তে হবে। যদি খুব বেশি নিঃসরণ হয়, তাহলে ক্রায়োথেরাপি দেওয়া যেতে পারে।

জটিলতা

মাসিকের সময় এখনও আমাদের দেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, রক্ত শোষণের জন্য কাপড় ব্যবহারের প্রথা রয়েছে। এক্ষেত্রে পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহৃত কাপড় ধুয়ে আলনার বা খাটের পিছনে অন্ধকারে শুকানো যাবে না। এতে রোগজীবাণু দ্রুত বাসা বাঁধে। অপরিচ্ছন্নতার জন্য জরায়ুতে বা তার আশেপাশে সংক্রমণ ঘটতে পারে এবং এর ফলে সারাজীবন তলপেটের ব্যথা নিয়ে স্থায়ী রোগী হয়ে বাঁচতে হতে পারে। এ-রোগের ইংরেজি নাম হচ্ছে পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ বা সংক্ষেপে পিআইডি। এ-রোগে অনেক সময় কোনো কোনো মহিলা গর্ভধারণের ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে।

অনেকসময় বয়স্ক মহিলাদেরও রক্তমিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হয়ে থাকে। বিষয়টিকে মোটেও অবহেলা করতে নেই। কারণ জরায়ুর ক্যান্সারে এমনটি হতে পারে।

যোনিপথের নিঃসরণ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে; এ-বিষয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে হবে; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার জন্য গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা করাতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাহলেই নিঃসরণজনিত মারাত্মক কিছু রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হতে পারে ■

যক্ষা রোগ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

এম মতিউর রহমান
প্রাক্তন ফিজিশিয়ান ম্যানেজার, স্টাফ ক্লিনিক, আইসিডিডিআর,বি

যক্ষা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রামক রোগ। মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস (*Mycobacterium tuberculosis*) নামক ব্যাকটেরিয়া এ-রোগের কারণ। একসময় প্রবাদ ছিলো "যার হয় যক্ষা তার নাই রক্ষা"। এখন সে-কথা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যক্ষা রোগের ফলপ্রসূ চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে, এই চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী এবং ব্যয়বহুল।

একজন যক্ষা রোগী যখন হাঁচি-কাশি দেয় তখন ৩ ফুট দূরে বসে-থাকা মানুষের মধ্যেও এ-রোগ সংক্রামিত হতে পারে। শরীরের এমন কোনো অঙ্গ নেই যেখানে এ-রোগ হতে পারে না। এ-রোগে আক্রান্ত মানুষ খিদেমন্দার কারণে একেবারে শুকিয়ে যায়। সেজন্যই আগের দিনে অনেকে একে ক্ষয়রোগ বলতো।

আমাদের দেশে যক্ষা রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। যারা অপুষ্টি ও ডায়াবেটিসে ভোগেন এবং যাদের শরীরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম সাধারণত তারাই এ-রোগে বেশি আক্রান্ত হন। অনেকে যক্ষা রোগকে অভিশাপ মনে করে গোপন রাখেন। বিনা চিকিৎসায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে রোগজীবাণু সারা শরীরে ছড়াতে থাকে। অথচ প্রাথমিক অবস্থায় যদি সঠিক চিকিৎসা নেওয়া হয়, তবে শতকরা ১০০ ভাগ রোগীই ভালো হয়ে যায়। অনেক যক্ষা রোগী ২-৪ মাস চিকিৎসার পর ভালো বোধ করলে চিকিৎসকের পরামর্শ উপেক্ষা করে চিকিৎসা বন্ধ করে দেন। এই প্রবণতা মারাত্মক ক্ষতিকর। ফলে রোগজীবাণু অষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা গড়ে তোলে এবং চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে জটিল করে তোলে, যা কখনোই কাম্য নয়।

আমরা যদি স্বাস্থ্যসচেতন হই, নিজের রোগ গোপনে না-পুষি, স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলি এবং শিশুদের বাধ্যতামূলকভাবে বিসিজি টিকা দিই, তবে যক্ষা রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

যক্ষা প্রতিরোধ করতে হলে যা যা করবেন

- শিশুর জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিসিজি টিকা দিয়ে দিবেন
- যথেষ্ট আলো-বাতাস ঢোকে এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরে বসবাস করবেন
- বিছানা-বালিশ মাঝেমাঝে রোদে দিবেন
- বাড়িঘর ও আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন
- হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় নিজেরা যেমন নাক-মুখ ঢেকে নিবেন, তেমনি শিশুদেরও এ-অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন এবং এ-বিষয়ে অন্যকেও পরামর্শ দিবেন

যক্ষা-আক্রান্ত রোগীর ফুসফুসের এক্স-রে চিত্র

- যক্ষায় আক্রান্ত রোগীর কফ এবং থুথু একটি নির্দিষ্ট ঢাকনা দেওয়া পাত্রে ফেলবেন এবং দেরি না-করে তা মাটিতে পুঁতে ফেলবেন
- যে-রোগীর কফে যক্ষার জীবাণু আছে সেই রোগীকে আলাদা রাখবেন

যা যা করবেন না

- যেখানে-সেখানে থুথু ও কফ ফেলবেন না
- এক ঘরে অনেক লোক ঘুমাবেন না
- যক্ষা রোগীর কাছে শিশুদের নিবেন না
- ছোট শিশুদের কোলে নিয়ে অনেকে চুমু দেয়, এটা খারাপ অভ্যাস। এর ফলে বড়দের রোগ শিশুদের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে
- যক্ষা রোগীর ব্যবহার্য জিনিসপত্র অন্যরা ব্যবহার করবেন না

যা যা খাবেন

- পুষ্টিকর ও সুষম খাবার খাবেন ও পরিবারের সবাইকে খাওয়াবেন যেন আপনারা পুষ্টিহীনতায় না ভোগেন
- চিকিৎসকের পরামর্শমত একজন যক্ষা রোগীকে পূর্ণমাত্রায় অষুধ খেতে হবে। মনে রাখতে হবে: পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়ার এই একটিই পথ

যা যা খাবেন না

- গরু বা ছাগলের দুধ জীবাণুমুক্ত (সিদ্ধ/পাস্তুরিত) না-করে খাবেন না
- বিড়ি-সিগারেট, তামাক-পাতা ও জর্দা খাবেন না ■

যৌনরোগের তথাকথিত স্থায়ী চিকিৎসা!

চটকদার বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত হবেন না

মুসাফির মোঃ তাজুল ইসলাম
আইসিডিডিআর,বি

ইদানিং ‘যৌনরোগের স্থায়ী চিকিৎসা’র আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনসম্বলিত লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন, সাইনবোর্ড বাংলাদেশের সর্বত্র চোখে পড়ে। সম্ভবত বাংলাদেশের কোনো বাস-লঞ্চ-স্টিমার এবং দেয়াল বাকি নেই যাতে অশ্লীল ভাষায় নানা যৌনরোগের লক্ষণ বর্ণনা করে এসব বিজ্ঞাপন সেঁটে দেওয়া হয় নি।

এসব বিজ্ঞাপনে যৌনরোগ-সংক্রান্ত বর্ণনা এতটাই অশ্লীল যে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে কোথাও যাতায়াতের সময় লজ্জা পেতে হয়। জলপথ ও স্থলপথে যাতায়াতের সময় অনেকসময় এসব লিফলেট আমাদের উদ্দেশে ছুঁড়ে মারে বিভিন্ন বয়সের কিছু বিতরণকারী। এতে বাচ্চাকে স্কুলে পৌঁছে দিতে মা কিভাবে বিব্রত হচ্ছেন, বোনের সাথে পাশাপাশি-বসা ভাই কিভাবে লজ্জা পাচ্ছেন, কিংবা এতে আমাদের নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে কি না এ-বিষয়গুলোর তোয়াক্কা করছেন না যৌনরোগ থেকে জাতিকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত এসব বিশেষজ্ঞ (!) চিকিৎসক। শহর-অঞ্চল ছাড়িয়ে এখন গ্রামাঞ্চলের পাড়া-মহল্লা-য়ও এসব দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হয় বাংলাদেশের মানুষ সবাই যৌনরোগে ভুগছে!

এতসব প্রচারণায় মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে পারে: যৌনরোগই হয়তো বাংলাদেশের প্রধান স্বাস্থ্যসমস্যা এবং এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ (!) হারবাল চিকিৎসকগণই তা নিরসন করতে সক্ষম! কিছু চিকিৎসকের টনিক বা অষুধ সেবনের সাথে সাথে সমস্যা সমাধানের ঘোষণা রয়েছে এসব বিজ্ঞাপনে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে যৌনরোগ বলতে বোঝায়: পুরুষ বা মহিলাদের যৌনাঙ্গে কোনো ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাকসহ বিভিন্ন জীবাণুঘটিত প্রদাহ যা রোগীর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এসব রোগ যেকোনো ধরনের যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে দ্রুত একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়ায়, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় sexually transmitted disease বা যৌনক্রিয়াবাহিত রোগ। এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া, ইউটিআই, ক্ল্যামাইডিয়া, ইত্যাদি এসব রোগের উদাহরণ।

যৌনরোগের প্রধান লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে: পুরুষদের ক্ষেত্রে পুরুষাঙ্গ দিয়ে রক্ত-পড়া, পুঁজ-পড়া, পুরুষাঙ্গে ফুসকুড়ি-পড়া, চুলকানো, লালচে দাগ-পড়া, লিঙ্গ নেতিয়ে-পড়া, প্রচণ্ড ব্যথা, ইত্যাদি এবং মহিলাদের যৌনাঙ্গে তীব্র ব্যথা, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, ঘন ঘন প্রস্রাব-হওয়া, সাদা স্রাব নিঃসরণ ও চুলকানি।

এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই চর্ম ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সুচিকিৎসা নিতে হবে। তা না-হলে মারাত্মক শারীরিক ক্ষতির শিকার হয়ে জীবন বিষময় হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের আলোচ্য বিশেষজ্ঞ (!) চিকিৎসকগণ যৌনরোগ বলতে এসব কিছুকে বাদ দিয়ে কেবল ভালোভাবে যৌনসুখ ভোগ করতে না-পারাকেই বুঝাচ্ছেন। তাদের ভ্রান্ত চিকিৎসার প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে অনেক নারী-পুরুষ হঠকারিতা, প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। অন্যদিকে, চিকিৎসক নামের এসব হঠকারী ব্যক্তি মানুষের কষ্টার্জিত টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিচ্ছেন।

স্বল্প সময়ে বীর্যপাতের কারণগুলো খতিয়ে দেখা যাক। আনন্দময় যৌনসঙ্গমের জন্য চাই যথাযথ পরিবেশ, আনন্দময় মূহুর্ত এবং যৌনসঙ্গীদের দু’জনের মধ্যেই মিলনের প্রবল আগ্রহ বা পরম ইচ্ছাশক্তি। এর একটির ঘাটতি থাকলে যৌনসঙ্গম ক্ষণস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অবশ্যই মনে রাখতে হবে: অবৈধ যৌনসঙ্গমেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না এবং মিলন দীর্ঘস্থায়িত্ব পায় না।

পুরুষাঙ্গের আকৃতির সঙ্গে যৌনরোগের কোনো সম্পর্ক নেই। জন্মসূত্রেই কোনো পুরুষের লিঙ্গ ছোট কিংবা বড় হতে পারে। পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্য যাই হোক রমণীর যৌনাঙ্গের সাথে তা খাপ খেতে বাধ্য কারণ স্ত্রীলিঙ্গের গভীরতা মাত্র ৬ ইঞ্চি। তাই এ-বিষয়ে মানসিকভাবে বিব্রত হওয়ার কিছুই নেই।

শুধুমাত্র আচরণ পরিবর্তন ও প্রবল ইচ্ছাশক্তিই সুখী দাম্পত্য জীবন নিশ্চিত করতে পারে। যেমন ধরা যাক, কোনো দম্পতির ক্ষেত্রে পুরুষ-সঙ্গীর অল্প সময়েই বীর্য নিঃসরণ হয়ে যায়। এটাকে রোগ ভাবার কোনো কারণ নেই। এজন্য ভয় পেলে বা দমে গেলে চলবে না। দু’জনের প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে যৌনসুখ ভোগ করা সম্ভব। যৌনমিলনের জন্য মেয়েদের উত্তেজিত হতে সময় লাগে। সেজন্য পুরষ-সঙ্গীকে যত্নের সাথে কিছু পরিচর্যার মাধ্যমে নারী-সঙ্গীকে উত্তেজিত করে নিতে হবে। অনেকের দাম্পত্যজীবনের প্রারম্ভে অনভিজ্ঞতার কারণে যথাযথভাবে যৌনসুখ ভোগ করা সম্ভব হয় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা বাড়লেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

যৌন উত্তেজনা একটি মনোদৈহিক বিষয়। নিরাশ হয়ে পড়লে শরীরও সায় দেয় না এবং এভাবে ধীরে ধীরে যৌনক্ষুধা এক পর্যায়ে আসলেই লোপ পেতে পারে। কারো কারো শারীরিক দুর্বলতার কারণেও যৌনক্ষুধা কম থাকতে পারে। এক্ষেত্রে মধুসহ প্রচুর পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে এবং দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে হবে। নিজ নিজ ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। এর পরও প্রকৃত অর্থেই যৌনসমস্যা দেখা দিলে রাস্তাঘাটের চটকদার বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট না-হয়ে এ-বিষয়ে সুশিক্ষিত কোনো ডাক্তারের সঙ্গে খোলামেলা আলাপ করে তাঁর চিকিৎসা ও পরামর্শ নিয়ে সুখী দাম্পত্যজীবন গড়ে তুলুন ■